সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩৯

অক্ষয়চন্দ্র সরকার
রামগতি ন্যায়রত্ন

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩৯

অক্ষয়চন্দ্র সরকার
রামগতি ন্যায়রত্ন

অক্ষয়চন্দ্র সরকার
রামগতি ন্যায়রত্ন

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—ফাল্গুন ১৩৫০

মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৩—২৩।২।১৯৪৪

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

১৮৪৬—১৯১৭

জন্ম ঃ বংশ-পরিচয়

১১ ডিসেম্বর ১৮৪৬ (২৭ অগ্রহায়ণ ১২৫৩) তারিখে অক্ষয়চন্দ্র চুঁচুড়া কদমতলায় এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম—গঙ্গাচরণ সরকার। গঙ্গাচরণ হুগলী কলেজের এক জন কৃতী ছাত্র, সে-যুগের সিনিয়র-বৃত্তিধারী।* ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি কলেজ ত্যাগ করিয়া সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হন। সরকারী কার্য্যব্যপদেশে তাঁহাকে অনেক দিন নদীয়া জেলায় কাটাইতে হইয়াছিল।

---

* গঙ্গাচরণও এক জন সুসাহিত্যিক ছিলেন। পুত্রের সম্পাদিত 'সাধারণী' ও 'নবজীবনে' তাঁহার অনেক রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত এই তিনখানি পুস্তক আমরা দেখিয়াছি :—

(১) ঋতুবর্ণন। (কবিতা) ইং ১৮৭৪। পৃ. বসন্ত ৪৫+নিদাঘ ৫৪। (২) হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা। ইং ১৮৭৯। পৃ. ৩২। (৩) বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা। ইং ১৮৮০। পৃ. ৭৪।

চন্দ্রনাথ বসু 'পৃথিবীর সুখ দুঃখ' পুস্তকের ৫৭ পৃষ্ঠায় গঙ্গাচরণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—"আমাদের শেষ পয়ার-প্রিয় ছিলেন অক্ষয় ভায়ার সর্ব্বজনসম্মানিত স্বর্গীয় পিতা রসসাগর গঙ্গাচরণ। তাঁহার কবিতা পড়িতে পড়িতে মনে হয়, আমাদের ঘরের লোকের দ্বারা লিখিত আমাদের ঘরের ও মরমের কথা পড়িতেছি।"

অক্ষয়চন্দ্রের শৈশব উলা বা বীরনগরে কাটিয়াছিল। তাঁহার বয়স যখন প্রায় দশ বৎসর, সেই সময় তিনি উলা ত্যাগ করিয়া চুঁচুড়ায় আসেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

> ১৮৫৬ সালের আশ্বিন মাসে উলা ছাড়িয়া আসি। তখন আমার বয়স পূরা দশ বৎসর হয় নাই। ইতিমধ্যে তিনবারকার বার্ষিক প্রভাকর আমি পড়িয়াছিলাম, অর্থাৎ সপ্তম বর্ষে আমি প্রভাকর পড়িয়াছি, বুঝিয়াছি, মুখস্থ করিয়াছি। ঐ তিন বৎসরের মধ্যে অন্নদামঙ্গল, তিন খণ্ড চারুপাঠ, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার, কাদম্বরী, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের আরবীয়োপাখ্যান ও শেক্ষ্‌পীয়র হইতে অপূর্ব্বোপাখ্যান, পাল-বর্জ্জিনিয়া প্রভৃতি পাঠ করিয়াছিলাম।...
>
> উলায় থাকিবার সময়ে, আমি ইংরাজী অতি অল্পই পড়িয়াছিলাম, কিন্তু যেটুকু পড়িয়াছিলাম বুঝিয়া-সুঝিয়া পড়িয়াছিলাম। আমি পড়িয়াছিলাম, ফাষ্ট নম্বর ও সেকেণ্ড নম্বর স্পেলিং, ফাষ্ট নম্বর রিডারের বার আনা, সেকেণ্ড নম্বর রিডারের অর্দ্ধেক। ইংরাজী ঐ পর্য্যন্ত; অঙ্ক বিষয়ে বাঙ্গালায় শিখিয়াছিলাম সমস্ত শুভঙ্করী ও ইংরাজী মতে সামান্য ও দশমিক ভগ্নাংশ। বাঙ্গালায় পিয়ারসনের ভূগোল আর ইয়েট্‌সের পদার্থবিদ্যা; বাঙ্গলা সাহিত্যের পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি।—"পিতা-পুত্র" : 'বঙ্গ-ভাষার লেখক', পৃ. ৪৮৭, ৫০৮।

ছাত্র-জীবন

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন অক্ষয়চন্দ্র "হুগলী কলিজিয়েট স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে সেকেণ্ড নম্বর রীডারের ক্লাসে ভর্ত্তি" হন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়—১৭ বৎসর বয়সে তাঁহার

বিবাহ হয়। তিনি হুগলী কলেজ হইতে পরীক্ষা দিয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এফ. এ. ও ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়িতে থাকেন এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সী কলেজের আইনের তৃতীয় শ্রেণীতে অক্ষয়চন্দ্রের সহাধ্যায়ী ছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র। অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছেন :—

> আমাদের কলিকাতার কালেজ জীবনের শেষাবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হইল। এমন অচ্ছিদ্র, উজ্জ্বল, বাচালতাশূন্য অথচ রসপরিপূর্ণ, হিন্দুভাবে অস্থিমজ্জায় গঠিত, অদৃষ্টবাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লেখায় ওতপ্রোত—কাব্যগ্রন্থ, বাঙ্গালায় আর নাই।···আমরা যৌবনের সেই ভাবোদ্বেল অবস্থায়, সংসার প্রবেশের সেই প্রথম উদ্যমে, এই অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালির লেখায় পাইয়া, একেবারে চরিতার্থ হইলাম। প্রেসিডেন্সী কালেজের আইনের তৃতীয় শ্রেণীতে, বঙ্কিমচন্দ্রকে আমাদিগের সহাধ্যায়ী পাইয়া, আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিলাম।··
>
> এখন যেখানে সিটি কালেজ, তাহার পশ্চিম ধারের তেতালা বাড়ী হইতে অর্থাৎ আপনার বাসাবাড়ী হইতে, আরদালিকে দিয়া ছাতা ধরাইয়া, বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কালেজের আইন শ্রেণীর গ্যালারিতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। সুন্দর, সুশ্রী-গঠন, পাতলা পাতলা দেহ, উন্নত নাসিকা, উজ্জ্বল চক্ষু, ঠোঁটের আশে পাশে একটু একটু হাসি আছে। কিন্তু সেই হাসির সঙ্গে আছে প্রবল গরিমা-জ্ঞান। আসেন, এক পার্শ্বে বসেন, চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, কাহারও সহিত কথা কহেন না।···আমাদের কাহার সহিত তখন বঙ্কিমবাবুর আলাপ হয় নাই।··· "পিতা-পুত্র", পৃ. ৫৩৩-৩৪।

ওকালতি

আইন পরীক্ষা দিয়া অক্ষয়চন্দ্র বহরমপুরে ওকালতি করিতে যান। তাঁহার পিতা তখন বহরমপুরের সদর মুন্সেফ। এই বহরমপুরেই তাঁহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় হয়, সেই পরিচয় কালক্রমে গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। বহরমপুরে তখন সাহিত্যিকমণ্ডলীর অপূর্ব সমাবেশ। অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছেন :—

> ৬৮ সালে আমার শিক্ষা সাঙ্গ হইল। আমি পিতার নিকট বহরমপুরে ওকালতি করিতে গেলাম।…তখন বহরমপুরে বাঙ্গালা-সাহিত্য চর্চ্চার বড় সুবিধা ছিল। ডাক্তার রামদাস সেনের বাড়ী সেইখানে। তাঁহার লাইব্রেরীতে বিস্তর বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ছিল। আর ভারতবর্ষের সংসৃষ্ট ইংরাজি পুস্তকও বিস্তর ছিল। বাঙ্গালা-ভাষা ও সাহিত্যের 'ইতিহাস লেখক' পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন, বহরমপুর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পিতৃদেব ঘুরিয়া ফিরিয়া বহরমপুরেই আসিয়া থাকিতেন। বাঙ্গালার ইতিহাস লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,—এই সময় বহরমপুরেই ওকালতি করিতেন। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর এই সময়ে এই বিভাগের পোষ্টাল ইনস্পেক্টর ছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয় বহরমপুর নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন; আর আমি যাবার কিছু কাল পরেই,—পিণ্ডান্ত পিণ্ড শেষ-স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র অন্যতর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া গেলেন। সুতরাং এ সময়ে বহরমপুরে বাঙ্গালা চর্চ্চার মহেন্দ্র যোগ বলিতে হইবে। আমি মহেন্দ্রক্ষণের সুযোগ অবহেলা করি নাই।—"পিতা-পুত্র", পৃ. ৫৩৬।

বহরমপুরে অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করেন। ইহার ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—বৈশাখ ১২৭৯ সাল। এই সংখ্যায় অক্ষয়চন্দ্রের "উদ্দীপনা" নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

বহরমপুরে পাঁচ বৎসর ওকালতি করিবার পর অক্ষয়চন্দ্র চুঁচুড়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন:—

> ১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইল। সেই বৎসর দুর্গোৎসবের পর, মাতাঠাকুরাণীর বায়ু রোগ বৃদ্ধি পাওয়ায়, আমি ওকালতি ছাড়িয়া দিলাম। বহরমপুরে আর গেলাম না, বাড়ীতেই রহিলাম।—"পিতা-পুত্র", পৃ. ৫৪৭।

সাময়িক-পত্র সম্পাদন

'সাধারণী'

প্রধানতঃ সরল ভাষায় রাজনীতি আলোচনার উদ্দেশ্যে অক্ষয়চন্দ্র চুঁচুড়া হইতে 'সাধারণী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিলেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১ই কার্ত্তিক ১২৮০। তিনি প্রথম সংখ্যায় লিখিলেন:—

> কতকগুলি স্থির নিয়মই ইহার জীবন ও সেইগুলি ইহা অবশ্যই দৃঢ়ব্রত সংকল্পে পালন করিবে।...
>
> সাধারণী হিন্দুজাতির পক্ষপাতিনী, বাঙ্গালির পক্ষপাতিনী। সাধারণী বর্ত্তমান রাজত্বের স্থায়িত্ব আকাঙ্ক্ষা করে, সাধারণের হিত কামনা করে; প্রজার মঙ্গল হয় ইহার ঐকান্তিকী ইচ্ছা। সাধারণী উপকার ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম জানে না; পীড়ন ব্যতীত যে অন্য কোন অধর্ম্ম আছে তাহা বোঝে না। ঐ ধর্ম্মই উহার বল; ঐ অধর্ম্মেই উহার ভয় হয়; আর স্বদেশীয়েরাও ইহার ভরসা,—তাহারাই ইহার আশ্রয়।...
>
> পূর্ব্বে বলিয়াছি এই পত্রিকা বর্ত্তমান রাজত্বের স্থায়িত্ব আকাঙ্ক্ষা করে—স্থায়িত্বের আকাঙ্ক্ষা করে বটে কিন্তু রাজ্যপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তনও

ইহার বাঞ্ছনীয়। দুঃখের বিষয় এই যে ইংরাজে অদ্যাপি রাজা শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা শাসন করিতেই ব্যস্ত, আইন করিতেই ব্যস্ত, ধনসংগ্রহ করিতে যেমন ব্যস্ত ধন ব্যয় করিতেও তেমনই ব্যস্ত, কিন্তু রাজার যে প্রধান কার্য্য প্রজারঞ্জন তাহাতে তাঁহাদিগের বিশেষ মনোযোগ নাই।...

'বঙ্গ-ভাষার লেখক' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত "পিতা-পুত্র" প্রবন্ধে অক্ষয়চন্দ্র 'সাধারণী' প্রচারের উদ্দেশ্য আরও স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন :—

> সাধারণী সাহিত্য এবং রাজনীতি সমভাবে সমানে সেবা করিবার নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, করিত ও তাহাই সাধারণী বলিত, ক্রন্দন ভিন্ন পলিটিক্স নাই। সুতরাং সরল বালিকার মতন কাঁদিত, ছোট ছোট আব্দার করিত। রাজপুরুষেরা অতি ছোট ছোট আব্দারে কর্ণপাত করিতেন; বড় আব্দার করিলে এখন মুখ বাঁকান, ভর্ৎসনা করেন, তখন বালিকার কথা বুঝিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। সাধারণীর ক্ষুদ্র কথায় রাজা কর্ণপাত করিতেন বলিয়া, সাধারণীর যৎকিঞ্চিৎ সম্মান ছিল। আর সাহিত্য-সেবা-পরায়ণা ছিল বলিয়া সাধারণীর যৎকিঞ্চিৎ সম্মান ছিল বাঙ্গালার কৃতবিদ্যের কাছে। বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শনের গুণে বাঙ্গালি বাবু সক্ করিয়া বাঙ্গালা পড়িতে শিক্ষা করেন। আর রাজনীতি জড়িত সাহিত্যের সক্ মিটাইবার জন্য,—সাধারণীর জন্ম। (পৃ. ৬৪৩)

জন্মাবধি ২য় ভাগ ১৪শ সংখ্যা (৪ শ্রাবণ ১২৮১) পর্য্যন্ত 'সাধারণী' কাঁটালপাড়ার বঙ্গদর্শন-যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল। অতঃপর অক্ষয়চন্দ্র স্বীয় বসতবাটীর সংলগ্ন একটি স্বতন্ত্র বাড়ীতে সাধারণী যন্ত্রালয় স্থাপন করিয়া 'সাধারণী' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ২য় ভাগ, ১৫শ সংখ্যা (১১ শ্রাবণ ১২৮১) 'সাধারণী'তে লিখিলেন :—

আজি সাধারণীর নূতন যন্ত্রে সাধারণী পত্রিকা প্রকাশিত হইল। আজি আমাদের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইতেছে, তাহা পাঠকে কখনই বুঝিতে পারিবেন না; যিনি মনের ভাব বুঝিবেন না, তাঁহার কাছে মনের ভাব বলিবও না। তবে একটি কথা বলা আবশ্যক হইতেছে,—এত দিন পরে সাধারণীর স্থায়িত্বে বিশ্বাস করিতে গ্রাহক-পাঠককে আমরা প্রশান্ত মনে অনুরোধ করিতে পারি। সংসারে যে ব্যক্তি স্ত্রীপুত্র-পরিবার-পরিবেষ্টিত, তাহাকে যেমন অধিকতর বিশ্বাস হয়, অধিকতর বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য, তেমনই আমাদের সাধারণী যখন এক্ষণে কল, কারখানা, ছাপাখানা লইয়া জড়ীভূতা হইয়া পড়িল, তখন সকলের ইহাকে অধিকতর বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য।

চুঁচুড়ায় ম্যালেরিয়ায় জর্জরিত হইয়া অক্ষয়চন্দ্র ১২৯১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে সাধারণী-যন্ত্র কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন। ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে ভবানীপুর এল. এম. এস. কলেজের অধ্যাপক গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'নববিভাকর' পত্রিকা 'সাধারণী'র সহিত সংমিলিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র 'নববিভাকর—সাধারণী' সম্পাদন করিতে থাকেন। চতুর্থ ভাগ, ২১ সংখ্যা (১৮ ভাদ্র ১২৯৬) পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া ইহার প্রচার রহিত হয়। 'বিশ্বকোষে'র "অক্ষয়চন্দ্র সরকার" প্রবন্ধের লেখক বলেন, "১২৯৭ সালে অকালে অক্ষয়চন্দ্রের পত্নীবিয়োগ হইলে পাঁচ মাসের কনিষ্ঠ পুত্র এবং অন্য ছয়টি সন্তানকে লইয়া তিনি অতিশয় বিব্রত হইয়া পড়েন। ফলে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে নববিভাকর—সাধারণী ও নবজীবন প্রকাশ বন্ধ করিয়া চুঁচুড়ায় গিয়া বাস করিতে হয়।" ইহা ঠিক নহে। অক্ষয়চন্দ্রের পত্নীবিয়োগ হয়—২ পৌষ ১২৯৭ তারিখে, ইহার অনেক আগেই 'নববিভাকর—সাধারণী' লোপ পাইয়াছিল।

'সাধারণী' ১৭ বৎসর গৌরবের সহিত পরিচালিত হইয়াছিল বঙ্কিমচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যরথীদের রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিত। 'সাধারণী'র প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র "জাতিবৈর" লিখিয়াছিলেন; ইহা পরিষৎ-প্রকাশিত 'বঙ্কিম-রচনাবলী'র "বিবিধ" খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এই 'সাধারণী' পত্রেই 'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা ও খ্যাতনামা লেখক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর হাতেখড়ি হয়।

'নবজীবন'

সাধারণী-যন্ত্র কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিবার অব্যবহিত পরেই ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাস হইতে অক্ষয়চন্দ্র 'নবজীবন' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'নবজীবন' প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি "পিতা-পুত্র" প্রবন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন:—

> সেই সময়ে কলিকাতার কলুটোলায় বঙ্গসাহিত্যের সম্রাট-রূপে বঙ্কিমবাবু বিরাজমান। শশধর তর্কচূড়ামণি মুঙ্গের হইতে আসিয়া, পথমধ্যে বর্দ্ধমান বিজয় করিয়া, কলিকাতায় শিবির স্থাপন করিতেছেন। বঙ্কিম বাবুর বৈঠকখানায় প্রতি রবিবারে সাহিত্য-সঙ্গত হয়। থাকেন চন্দ্রনাথ বসু দাদা মহাশয়, এখন পরলোকগত তখন বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সরকারী অনুবাদক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, খিদিরপুরের দুই মহাত্মা,—কবিবর হেমচন্দ্র এবং তাঁহার শিষ্য যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ,—বঙ্কিমবাবুর প্রতিবাসী প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম, কেশববাবুর সহোদর কৃষ্ণবিহারী সেন, পরে কটক কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নীলকণ্ঠ মজুমদার প্রভৃতি। মধ্যে মধ্যে আসেন বারাসতের ডেপুটি তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। বর্দ্ধমানের ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রভৃতি। বঙ্কিমবাবু ত অবশ্যই থাকিতেন। কলিকাতায় বাসা করার পর প্রতি রবিবার অপরাহ্নে ত বটেই, অন্য অন্য সময়েও সেইখানে

যাইতাম। চূড়ামণি মহাশয়ও এক এক দিন থাকিতেন। সাহিত্য সেবার সভায় ধর্ম্মের কাহিনী উঠিল। চূড়ামণি মহাশয় আলবট হলে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। শাস্ত্রসঙ্গত ধর্ম্ম ব্যাখ্যার সঙ্গে, তিনি বিজ্ঞানের দোহাই, হাঁকাইয়া দিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম বিজ্ঞানের উপর দাঁড়াইবে, কথাটা নিতান্ত উল্টা কথা বলিয়াই আমার বোধ হয়। সাধারণীতে এই মতের প্রতিবাদ করিলাম। ধর্ম্মই সকলের আশ্রয়, ধর্ম্মই সকলের অবলম্বন, ধর্ম্ম আবার বিজ্ঞানের আশ্রয় লইবে কেন? এই সকল কথার আলোচনার ফলে নবজীবন প্রকাশিত হইল। নবজীবনের সূচনাতেই লিখিলাম "যে বিশাল মহান্ স্তর সমাজতত্ত্বাদির আশ্রয়স্বরূপ, অবলম্বন-স্বরূপ হইয়া ঐ সকলকে গর্ভে ধারণ করত অনবরত উহাদের পুষ্টিসাধন, অবস্থা পরিবর্ত্তন, এবং ক্ষয়সাধন করিতেছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া,—সেটি যে অবলম্বন এবং আশ্রয়, কিয়ৎ পরিমাণে উপাদান এবং হেতু, তাহা না বুঝিয়া,—সেইটিই সকল তত্ত্বের সারতত্ত্ব—সম্পূর্ণরূপে না হৌক, কিন্তু অংশত সকল তত্ত্বের একেবারে সমবায়ী, অসমবায়ী এবং নিমিত্ত কারণ, ইহা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া,—কোনও তত্ত্বের কথা কহিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। চিন্তাশীল বাঙ্গালি দেখিতে দেখিতে এই অন্তরস্তরের আভাস পাইয়াছেন। একটু একটু বুঝিতেছেন, যে, সেই মূলীভূত সারস্তরের কথা উপেক্ষা করিয়া সাম্যবাদ বা বৈষম্যবাদ, বিতর্কবাদ বা স্থিতিবাদ, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। সেই বিশাল মহান্ আশ্রয়-স্তরের নাম—**ধর্ম্ম**।" (৬৪৫-৪৬)

'নবজীবন' পাঁচ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। ইহার শেষ সংখ্যা—৫ম ভাগ, ১২শ সংখ্যা, ভাদ্র ১২৯৬। 'নবজীবন' একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্র ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মহারথীদের রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিত।

‘ভারত-সভা’

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ দেশভক্তগণের উদ্যোগে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ জুলাই কলিকাতায় ভারত-সভা বা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

‘ব্যবস্থাদর্পণ’-প্রণেতা শ্যামাচরণ সরকার এই রাজনৈতিক সমাজের সভাপতি, আনন্দমোহন বসু সম্পাদক, এবং অক্ষয়চন্দ্র ও যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ যুগ্ম সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

চতুষ্পাঠী ও ‘সাধারণী-স্কুল’ প্রতিষ্ঠা

“দেশে ক্রমেই নিষ্ঠাবান্ সংস্কৃতজ্ঞ পুরোহিতের অভাব ঘটিতেছে, কাজেই হিন্দুর নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠুভাবে ও শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সম্পন্ন হইতেছে না লক্ষ্য করিয়া এবং দেশমধ্যে যাহাতে ধর্ম্মচর্চ্চা এবং শাস্ত্রানুশীলন বহুবিস্তৃতি লাভ করে এই উদ্দেশ্যে অক্ষয়চন্দ্র স্বীয় বাড়ীর সংলগ্ন স্বতন্ত্র দুইটি বাড়ীতে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকাল মৃত্যুর পর এই চতুষ্পাঠীর নামকরণ করিয়াছিলেন ‘অমর-চতুষ্পাঠী’। প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরিয়া অমর-চতুষ্পাঠী বহুতর ছাত্রকে শিক্ষাদান করিয়া বাঙ্গলার যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করিয়াছে। ব্রাহ্মণের পুনরভ্যুদয়ের জন্য, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থানের জন্য অক্ষয়চন্দ্র চিরদিন নানা ভাবে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এই সাধু উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই তিনি ‘নবজীবন’ প্রচারে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—‘ব্রাহ্মণ এখনও হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয়। ব্রাহ্মণের পুনরুত্থান সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক; ব্রাহ্মণ উঠিলে সকলের উদ্ধার সহজ হইবে।’

"চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া উহার প্রতিপালন করা ভিন্ন শিক্ষাবিস্তার-কল্পে অক্ষয়চন্দ্রের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ইংরেজী উচ্চ-বিদ্যালয় পরিচালনা। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ বিদ্যালয় 'হিন্দু-স্কুল' উঠিয়া গেলে অক্ষয়চন্দ্র ইহার যাবতীয় আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম ক্রয় করেন এবং 'সাধারণী-স্কুল' স্থাপিত করিয়া প্রায় দশ বৎসর যাবৎ এই স্কুল পরিচালনা করেন। সাধারণ তত্ত্বাবধান করা ভিন্ন তিনি প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে তিন চারি ঘণ্টা বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। সাধারণী-কার্য্যালয় কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইলে এই স্কুল উঠিয়া যায়।"—'বিশ্বকোষ' (২য় সং.), পৃ. ৮৮।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহ-সভাপতি

১৩০৪, ১৩০৫ ও ১৩২০ সালে বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষৎ অক্ষয়চন্দ্রকে অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত করিযা তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে অক্ষয়চন্দ্র তিনটি অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। ১৩১৮ সালের ১৯-২১ ফাল্গুন চুঁচুড়ায় পঞ্চম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে অক্ষয়চন্দ্র অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণটি ১৩১৮ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র-সংখ্যা 'বসুধা' পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে।

পর-বৎসর ৯-১০ চৈত্র তারিখে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে অক্ষয়চন্দ্র মূল-সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার

অভিভাষণটি ১৩১৯ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্য-সম্মিলনের নিয়মানুসারে পূর্ব্ব-বৎসরের সভাপতির অভিভাষণ দ্বারা সভার কার্য্য আরম্ভ করা হয়। ১৩২০ সালের ২৭-২৯ চৈত্র তারিখে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সপ্তম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে ভূতপূর্ব্ব সভাপতিরূপে অক্ষয়চন্দ্র যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহা ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছে।

মৃত্যু

২ অক্টোবর ১৯১৭ তারিখে, ৭১ বৎসর বয়সে, চুঁচুড়ার বাড়ীতে অক্ষয়চন্দ্র পরলোক গমন করেন।

গ্রন্থাবলী

অক্ষয়চন্দ্রের রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :—

১। **শিক্ষানবিশের পদ্য**। ভাদ্র ১২৮১ (ইং ১৮৭৪)। পৃ. ৫৬।

> "শিক্ষানবিশের পদ্য প্রকাশিত হইল। ইহা উভয়তঃ শিক্ষানবিশের ; কেন না যখন লিখি তখন আমি শিক্ষানবিশ, এবং এক্ষণে শিক্ষানবিশের জন্যই এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হইল।
>
> বিষয় কার্য্যের শিক্ষানবিশী অবস্থায় অবকাশকালে বায়রণ হইতে একটু আধটু অনুবাদ করিতাম। তাহাতে দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রধান উদ্দেশ্য ছন্দোবদ্ধ রচনা লিখিতে অভ্যাস করা ; গৌণ উদ্দেশ্য অবকাশ কর্ত্তন ;…

অবিকল ভাষানুবাদ করি নাই, রসানুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।...

কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশের একটী বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। ইহাতে বালকবৃন্দের কিছু উপকার হইতে পারিবে। রসপূর্ণ কাব্য গ্রন্থ হইতে ছন্দোবন্ধে রসানুবাদের চেষ্টা করিলে, অল্প অল্প ছন্দোবোধ হয়, রসগ্রাহকতা কিঞ্চিৎ জন্মে, এবং ভাষাজ্ঞানও কিছু পরিপুষ্ট হয়। যাঁহারা বালকবৃন্দের ঐ ত্রিবিধা উন্নতির কামনা করেন, তাঁহারা শিক্ষানবিশের পদ্য হইতে, বোধ হয় কিছু সাহায্য পাইতে পারিবেন। এবং এমনও বোধ হয়, যে বালকে আপনা আপনি এই ক্ষুদ্র পুস্তক হইতে কিছু ফল লাভ করিবে।

আর একটি কথা আছে। এই পুস্তকের অধিকাংশই বায়রণের অনুবাদ ও অনুকরণ। যাঁহারা ইংরাজি বুঝেন না তাঁহারা বায়রণের অনুবাদ হইতেও স্বদেশানুরাগ শিক্ষা করিতে পারিবেন। আর এ শিক্ষা সংশিক্ষা।...

'বন্দীর বিলাপ', 'ভারতবর্ষ' ও 'সাগর' বায়রণের অনুবাদ ও অনুকরণ। 'নারী', মহাভারত হইতে। 'একদিন', কোন ইংরাজি সাময়িক পত্রের অনুকরণে লিখিয়াছিলাম; সে পত্রের নাম পর্য্যন্ত স্মরণ নাই। 'হাসি কান্না' ও 'মৃত্যু' স্বরচিত।

শিক্ষানবিশের ছন্দোবন্ধ পূর্ব্ব প্রথানুযায়ী নহে; ত্রয়োদশ বর্ণ সমষ্টিকে অর্দ্ধ পয়ার রূপে গণ্য করিয়াছি, আবার অনেক স্থানে সেই অর্দ্ধ পয়ারে ষোলটি অক্ষর আছে। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, একত্র মাখামাখি করিয়াছি।...” ভূমিকা।

২। **প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ।** অগ্রহায়ণ ১২৮১-৮৩ সাল।

১। বিদ্যাপতি, ২। চণ্ডীদাস, ৩। গোবিন্দদাস, ৪। রামেশ্বরের

সত্যনারায়ণ, ৫। মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল*। এগুলি সারদাচরণ মিত্র ও শোভাবাজারের বরদাকান্ত মিত্রের সহযোগিতায় ১২৮১ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হয়। ১২৯১ সালে এগুলি দুই খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হয়।

৩। **সমাজ-সমালোচন,** ১ম ভাগ। পৌষ ১২৮১ (ইং ১৮৭৪) পৃ. ९৭।

ইহাতে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত "উদ্দীপনা" ও "গ্রাবু" নামে দুইটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

৪। **গোচারণের মাঠ।** (কাব্য) বৈশাখ ১২৮৭। পৃ. ২৪।

যুক্তাক্ষরবর্জ্জিত পয়ার ছন্দে লিখিত পল্লীচিত্র।

৫। **হাতে হাতে ফল।** (প্রহসন) ১২৮৯ সাল। পৃ. ৫৯।

হাতে হাতে ফল। / (হসন-হাসন।) / শ্রীবঙ্গবিলাস সমজ্‌দার / প্রণীত। / "যেদিকে ফিরাই আঁখি, / সুখময় সকলি দেখি।" / ১২৮৯ /

এই পুস্তিকার ভিতরের আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল "১২৮৮" আছে।

৬। **সংক্ষিপ্ত রামায়ণ।** ইং ১৮৮২। পৃ. ১৬।

মূল ও গদ্যানুবাদ।

৭। **আলোচনা।** ইং ১৮৮২। পৃ. ১৯৮।

সূচী :—পশুবৃত্তি, বাণিজ্যে পর-প্রত্যাশা, ধর্ম্ম, মাংসাহার, শক্তি, বাঙ্গালির বিজ্ঞান চর্চ্চা, একতা, রাজনীতি শিক্ষা, অর্জ্জনস্পৃহা, বিদেশ

---

* ২৮ চৈত্র ১২৮২ তারিখের 'সাধারণী' পত্রে 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে'র বিজ্ঞাপনে প্রকাশ :—"৪। মুকুন্দরাম। (চণ্ডী), শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুঁথি, অপর একখানি জীর্ণ পুস্তক এবং বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে।"

রঙ্গলাল-প্রকাশিত উল্লিখিত 'চণ্ডী'র কথা আমরা 'রঙ্গলাল' পুস্তকে উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছি। এই পুস্তকখানি আমরা এখনও কোথাও দেখি নাই।

ভ্রমণ, আভিজাতিক গৌরব, সংখ্যার দাসত্ব, অহঙ্কার, শিক্ষিত অশিক্ষিতে পার্থক্য, কোন্‌টি নিকটে কোন্‌টি দূরে স্থির করা আবশ্যক, কৃপণ, ভারতমধ্যে বৈষম্য অন্তরে সাম্য আছে, সোণা রূপার কথা, ভবিষ্যতের জন্য আমরা কি করিতেছি, উল্কাপাত, বারইয়ারি, দান করে নাম কেনা, মরীচ দ্বীপে আকের চাষ ও চিনির কারবার, সাধারণের উন্নতি, শরীর পালন, প্রাচীন মিউনিসিপল প্রথা, দেশভক্তি, শক্তিসেবা, ষোল শত বৎসর পূর্ব্বে রোমরাজ্যের পরিশ্রমের মূল্য ও আহারীয় সামগ্রীর দর কত ছিল, সমগ্র ভারত, সামাজিকতা, মামলাবাজ, রাজনীতিবাজ, হৃদয়ের দান, আপনার অবস্থা অগ্রে বুঝা আবশ্যক।

৮। **সনাতনী**। ১ মাঘ ১৩১৭ (ইং ১৯১১)। পৃ. ১৮৬।

সনাতন ধর্ম্ম, দর্শন ও সমাজ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধমালা।

৯। **কবি হেমচন্দ্র**। অগ্রহায়ণ ১৩১৮। পৃ. ৮৩।

হেমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কাব্য-সমালোচন।

১০। **মোতি-কুমারী**। কার্ত্তিক ১৩২৪। পৃ. ১৩০।

ইহাতে অক্ষয়চন্দ্রের এই কয়টি লঘু ও সরস রচনা স্থান পাইয়াছে :—১। মোতি-কুমারী, ২। বন্দরসিক, ৩। কুঞ্জ সরকার, ৪। সুন্দর-বনে ব্যাঘ্রাধিকার, ৫। হলধর ঘটক, ৬। পূজার গল্প, ৭। মশক। প্রথমটি ১৩১৫ সালের 'পূর্ণিমা'য়, ২য়—৪র্থটি প্রথম বর্ষের (১২৯১) 'নবজীবনে', ৫ম ও ৬ষ্ঠটি যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের 'নবজীবনে' এবং সপ্তম বা শেষটি ১২৮২ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রথমে প্রকাশিত হয়।

১১। **মহাপূজা**। আশ্বিন ১৩২৮। পৃ. ৪৮।

ইহাতে 'সাধারণী' ও 'নবজীবন' হইতে সঙ্কলিত দুর্গাপূজাবিষয়ক এই চারিটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে :—১। শারদীয়া মহাপূজা,

২। শক্তি-সেবা, ৩। স্বপ্নে আমার দুর্গোৎসব, ৪। বাঙ্গালির দুর্গোৎসব।

এই পুস্তকের মুখবন্ধ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত।

১২। **রূপক ও রহস্য।** জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০। পৃ. ২১৭।

"এই পুস্তকের মধ্যে যে ছত্রিশটি রচনা মুদ্রিত হইল, তাহার সকলগুলিই ১২৭৯ হইতে ১২৯৭ সালের লেখা; অর্থাৎ পিতৃদেবের জীবনের মধ্যভাগের রচনা,—প্রায় ৩২ হইতে ৫০ বৎসর আগের রচনা। সকল লেখাই রূপক ও রহস্য শ্রেণীর, সেই জন্য পুস্তকের নাম 'রূপক ও রহস্য' দেওয়া হইয়াছে।"—গ্রন্থ-পরিচয়।

সূচি:—১। শুধুই রহস্য, ২। নূতন মতে নূতন পঞ্জিকা, ৩। চারিটি চুটকি, ৪। গ্রন্থ-রহস্য, ৫। দিগম্বর ভট্টাচার্য্য, ৬। চণকচূর্ণ (ভক্তি), ৭। তুলনায় সমালোচন, ৮। নব মাথুর সংবাদ (কবিতা), ৯। তালতলার চটি, ১০। নবজীবনের আটকৌড়ে (ছড়া), ১১। তোমরা যদি আর্য্য হও, আমরা অনার্য্য, ১২। নাম, ১৩। চণকচূর্ণ (প্রহেলিকা), ১৪। চুল্লি না নির্ব্বাণ হয়, ১৫। নূতন বেতাল পঁচিশ, ১৬। শিরোবচন নাটক, ১৭। ভাই হাততালি, ১৮। পদ্য-পত্র (কবিতা), ১৯। সম্পাদকের নানা জ্বালা, ২০। বিজ্ঞাপন, ২১। বিষম বাজার বা সম্মার্জ্জনী-মেলা, ২২। চণকচূর্ণ (চুঁচুড়ার সং), ২৩। উপন্যাস, ২৪। মতিচুরের সঙ্গে সঙ্গে চেনাচুর, ২৫। নব বাণিজ্য (ছন্দ), ২৬। চণকচূর্ণ (সংবাদ-পত্র), ২৭। ক্রোটনের কথা, ২৮। সাধারণীর প্রশ্নোত্তর, ২৯। ক্ষুদ্রের নিবেদন, ৩০। মহৎ—ক্ষুদ্রের প্রতি, ৩১। সিংহের উপাধি বিতরণ, ৩২। চণকচূর্ণ (অনাদায়), ৩৩। জন্তুধর্ম্মী মানব, ৩৪। শুক-সারী-সংবাদ (গান), ৩৫। গ্রাবু, ৩৬। নব বোধোদয়।

ইহার ৭ম ও ৩৫ সংখ্যক রচনা 'বঙ্গদর্শন' হইতে, ১৮শ সংখ্যক রচনা 'প্রতিমা' হইতে এবং বাকীগুলি 'নবজীবন' ও 'সাধারণী' হইতে গৃহীত।

১৩। **সাহিত্য-সাধনা**। ১৩৩০ সাল।

কিশোরগণের উপযোগী সাহিত্যবিষয়ক রচনাবলী।

১৪। **সাহিত্য-পাঠ**। ১৩৩১ সাল (২য় সং)।

পাঠ্য পুস্তক।

অক্ষয়চন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলা সাহিত্য-সংসারে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের এক দিন অমিত প্রতাপ ছিল। বঙ্কিম-সূর্য্য যখন মধ্যগগনে, অক্ষয়চন্দ্র তখনই 'সাধারণী' মারফৎ বঙ্কিম-পরিমণ্ডলের অন্যতম জ্যোতিষ্করূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কমলাকান্তে' অক্ষয়চন্দ্রের একটি রচনাকে স্থান দিয়া চিরসম্মানিত করিয়া গিয়াছেন। ১২৯১ বঙ্গাব্দে 'নবজীবন' মাসিকপত্র যখন অক্ষয়চন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তখন প্রধানতঃ তাঁহার হাতে রাজ্যভার দিয়া সাহিত্য-জগৎ হইতে প্রায় বিদায় লইয়াছেন। এই 'নবজীবনে' এবং 'নবজীবনে'র পনর দিন মাত্র ব্যবধানে প্রকাশিত 'প্রচার' মাসিক পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মতত্ত্ব ও অনুশীলনের ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন; অক্ষয়চন্দ্রই একপ্রকার সাহিত্য-জগতের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কার্য্য যে তিনি বিশেষ সক্ষমভাবে সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার অনেক সমসাময়িক প্রমাণ আছে।

অক্ষয়চন্দ্রের বিশেষত্ব ছিল তাঁহার অকৃত্রিম দেশাত্মবোধ ও স্বদেশ-প্রীতি, বাঙালীর যাহা কিছু সম্পদ্ বলিয়া তিনি জ্ঞান করিতেন,

তাহাকেই তিনি সকল আক্রমণ হইতে পক্ষীমাতার মত রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন, ইহা শেষ পর্য্যন্ত অনেকটা জেদে দাঁড়াইয়াছিল এবং প্রগতিশীল নূতনদের কাছে অক্ষয়চন্দ্র গোঁড়া বলিয়া নিন্দিত হইয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু 'পৃথিবীর সুখ দুঃখ' পুস্তকের ৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—"...অক্ষয়চন্দ্র বাঙ্গালীর ঘরের কথা ও মনের কথা ভক্তের ন্যায় ভালবাসেন, এবং পাঁতি পাঁতি করিয়া দেখেনও বটে।" বাঙালীর ঐতিহ্য ও সংস্কারকে অক্ষয়চন্দ্র প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন এবং তাহার ভাল দিক্‌টিকে যুক্তি দিয়া সকলের গ্রাহ্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার চেষ্টা সে-যুগে অংশতঃ সফল হইয়াছিল।

অক্ষয়চন্দ্রের ভাষা সহজ সরল হৃদয়গ্রাহী ছিল। তাঁহার বক্তব্য তিনি উকিলের মত যুক্তি দিয়া পাঠকের মর্ম্মে গাঁথিয়া দিতে পারিতেন, ভাবের উচ্ছ্বাসও তাঁহার রচনার আর একটি বিশেষত্ব ছিল। বাংলার প্রাচীন পদাবলী প্রচারেও তাঁহার উদ্যম স্মরণীয়।

অক্ষয়চন্দ্রের একটি রচনা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

'নবজীবন', মাঘ ১২৯৯ :—

ভাই হাততালি! তোমার দুটি হাতে ধরি, তুমি ভাই একবার ক্ষান্ত হও,—তোমার চট্‌ চট্‌ গর্জ্জনে একবার বিরাম দাও। যে বিধির বিড়ম্বনায় অগাধ জলে পড়িয়াছে, তাহাকে মাথায় ঘা দিয়া ডুবাইয়া দিলে আর কি পুরুষার্থ আছে? আমরা ত অগাধ জলেই আছি, তবে ভাই হাততালি! আর আমাদিগকে ডুবাইয়া দিবার জন্য তোমার এত আড়ম্বর কেন?

তুমিই ত স্বর্গের কেশবচন্দ্রকে মর্ত্ত্যের মাটি করিয়াছিলে। সেই প্রশস্ত হৃদয়, সেই অগাধ অধ্যবসায়, সেই অচলা ভক্তি, সেই প্রবলা নিষ্ঠা, সেই আনন্দের ব্রহ্মানন্দ। তোমার চাটুপটু চট্‌চটিতে সেহেন কেশবচন্দ্রের মস্তক ঘূর্ণিত হইয়াছিল, পদস্খলিত হইয়াছিল, তাঁহার শরীর অবশ করিয়াছিল। ভাই!

এমনই করিয়া কি বাঙ্গালার মুখ হাসাইতে হয়। কালামুখ হাততালি তুমি ক্ষান্ত হও। তোমার গভীর গর্জ্জনের তাড়নায় দুর্জ্জয় কেশবচন্দ্রের তির্য্যক্-গমনের কথা ভাবিতে গেলে এখনও আমাদের হৃৎকম্প হয়। প্রথম সেই সুন্দর, গৌর, সৌম্য, শান্ত মূর্ত্তির ছদচ্ছাদিত সেই দেবব্রত, উপাসনারত, নিষ্ঠাপূর্ণ, ভক্তিভর হৃদয়ের কথা মনে আসে; সঙ্গে সঙ্গে সেই কূট-দর্শন-তর্ক-ভেদকারিণী তীক্ষ্ণাবুদ্ধি, আধ্যাত্মিক শাস্ত্রালোচনায় যাপিত সেই অগাধ পরিশ্রম, সেই অকাতর অবিরাম ধর্ম্মালোচনা, সেই উজ্জ্বল কিরণ বিকিরণ কারিণী উদ্দীপনা—সকলই মনে আসে। তাহার পর তোমার তালি-তাড়িত বায়ুবিগুণে, সেই ধীর প্রশান্ত মানবের, তখন ভ্রষ্ট ধূমকেতুর ন্যায় বিকক্ষে বিপথে, কেন্দ্র হইতে দূরে বিদূরে হিমপরি-পূরিত নীহারিকাময় গগনপ্রান্তে পরিভ্রমণ—সকলই মনে পড়ে। তখন ভাই হাততালি, তোমার কৃতিত্ব চিন্তা করিয়া ভয় হয়, তোমার কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া তোমাকে ভাই বলিতে লজ্জা হয়; তোমার কৃত কার্য্যের পরিণাম ভাবিয়া অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। আর তুমি একটির পর একটি, তাহার পর আর একটি এমনই করিয়া ক্রমে ক্রমে আমাদের সকল শুভ গ্রহেরই নিগ্রহ করিতেছ;—তোমার শ্রান্তি নাই, ক্ষান্তি নাই, শান্তি নাই। বরং জয়োন্মাদে উল্লসিত হইয়া দিন দিন আরও বল সঞ্চয় করিতেছ—এই সকল কথা ভাবিয়া মন অস্থির হয়, হৃদয় নিরাশ হয়, প্রাণ শুকাইয়া যায়।

যে দিন শুনিলাম, তুমি কুহকী কতকগুলি লোককে কুহকে মজাইয়া মানুষকে অতিমানুষ বলিয়া পূজা করিতে লওয়াইয়াছ, আর তাহারা ভক্তি-তামসে জ্ঞানাচ্ছন্ন করিয়া, স্বর্গের কেশবচন্দ্রকে মর্ত্ত্যের দেবতা বানাইতেছে, তখনই বুঝিলাম দুরাত্মন্ হাত তালি, তোমার নিশ্চয়ই দুরভিসন্ধি আছে। তোমার চাটুপটু রসনা-ধ্বনিতে নর-নারায়ণ অর্জ্জুন বিচলিত হইয়াছিলেন, দুর্ব্বল বঙ্গসন্তান যে বিচলিত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কেশবচন্দ্র ভ্রষ্টলক্ষ্য কক্ষনষ্ট হইয়া বিপথে বিচলিত হইলেন।

একদিন যে কেশবচন্দ্র য়ূদীয় অবতার খৃষ্টের পূর্ণসত্তা হৃদয়ে ধারণ করিয়া,

স্বীয় প্রশস্ত হৃদয়ের বিমল দর্পণে ঈশ্বরের অতুল জ্যোতিঃ উজ্জ্বল কিরণে প্রতিভাত দেখিয়া ঈশ্বর সাক্ষাৎকারে, গভীর গর্জ্জনে সিয়ালদহের বিস্তৃত প্রকোষ্ঠ কম্পিত করিয়া বলিয়াছিলেন (Father forgive them ; they know not what they do)—"পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা করিবেন, ইহারা জানে না যে কি করিতেছে।" সেই দিনের সেই ভক্তিহুঙ্কারে উপস্থিত সাক্ষণের পাষাণ হৃদয়ও চমকিত হইয়াছিল, দুর্জ্জয় ইংরাজও সেই ক্ষেত্রে তখন একবার ভাবিয়াছিলেন—বাস্তবিক তাঁহারা যে কি করিতেছেন, তাহা কি তাঁহারা জানেন না ? কেশবচন্দ্রের সেই একদিন—আর সেই কেশবচন্দ্র কয়বৎসর পরে, তেমনই প্রকাশ্য স্থানে, তেমনই জনতামধ্যে, তেমনই উচ্চকণ্ঠে, পাতকী ! তোমার কুহকে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন—(Yet I am a singular man)—"তথাপি আমি একজন বিচিত্র মানব।" মৃন্ময় অবতারের পরিত্যক্ত সেই উচ্চ বেদীতে অধিষ্ঠিত কেশবচন্দ্র, আর এই 'গোরীদার' সেন-বংশের ধরাতলস্থ কেশবচন্দ্র ; সুমেরু কুমেরু ব্যবধানেও এই দূরত্ব পরিমাণের মানদণ্ড হয় না। পোড়া হাততালি। তোমার কলঙ্কের কীর্ত্তিতেই না এই কাণ্ড হইল। ইহাতেই কি তুমি ক্ষান্ত হইয়াছিলে ? তাহার পর সেই বিচিত্র মানবকে বন্যার মুখাভিলাষে বৈষয়িক করিলে, তাঁহার বক্ষঃ বিস্মিত করিলে, বুদ্ধি বিড়ম্বিত করিলে,—এখন সে সকল কথা ভাবিতে গেলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। তাই হাত ধ'রে, ভাই হাততালি তোমাকে বলিতেছি—ভাই দিনকতক তুমি ক্ষান্ত হও। আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারিও না।

তোমার আর একবারের কলঙ্কের কথা বলি। বিদেশিনী, দুঃখিনী, বিদুষী রমাবাই ভিক্ষা করিতে ভ্রাতা সঙ্গে বঙ্গদেশে আসিলেন। তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিতা, ভাগবতে ব্যুৎপন্না, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী, পরিশ্রমনিরতা ও কার্য্যে পটীয়সী। এ হেন স্ত্রীরত্ন ভারতের আদরের ধন, সাধের সামগ্রী, আরাধ্য বস্তু, পূজনীয়া দেবতা। তিনি তখন কুমারী নবদুর্গা ; সাক্ষাৎ ভগবতী। কুমারী-পূজা ভারতে চির-প্রচলিত। কিন্তু অভাগা বঙ্গবাসী তাহার চির প্রচলিত প্রথা এইবার

পরিত্যাগ করিল। সসম্মানে কুমারীর পূজা করিয়া, তাঁহাকে দক্ষিণা দিয়া বিদায় দিতে পারিত; তাহা করিল না; বুঝিল না। তুমি হাততালি। বালকের সহায়, নবরঙ্গের বন্ধী; কিন্তু প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, সকলে তোমাকে সহায় করিয়া রমার তোষামদ করিল। রমা বিদূষী হইলেও অবলা, পণ্ডিতা হইলেও কোমলপ্রাণা, বুদ্ধিশালিনী হইলেও ক্ষীণমাত্র। কাজেই রমার মাথা ঘুরিল; মন টলিল; হৃদয় গলিল; আগুন জ্বলিল।—সে আগুন এখনও নিবে নাই।

একদিন ছিল, এক সময়ও ছিল, তখন রমার অগ্রজ সস্নেহ অথচ কর্কশকণ্ঠে "এ ৎ রম" বলিয়া ডাকিলে রমা ভয়ে ভয়ে, ধীর পদবিক্ষেপে, ললাটে নাদবিন্দু-ধারিণী সাক্ষাৎ গায়ত্রী মত অগ্রজের পার্শ্বে সলজ্জভাবে আসিয়া দণ্ডায়মান হইতেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি পবিত্র সাবিত্রী বলিয়াই বোধ হইত। সেই রমা তোমার বায়ুবিগুণে বৈদেশিক আসুরিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যে দিন দয়ানন্দ স্বামীকে সাহঙ্কার উত্তর প্রদান করিলেন,—ভারতের গৌরবশ্রী যে দিন সেই উত্তরের অহম্মুখতায় অধোবদনে রোদন করিল; সেই আর একদিন—আর, আর—যে দিন সেই রমা বিদেশে, বিবান্ধবে, বিচল চিত্তে বিধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন—সেই একদিন, সেই এক দুর্দ্দিন। তাই বলিতেছিলাম পোড়া হাততালি তুমি কি সকল সময়ই আমাদের কেবল অহিত সাধন করিবে? তোমার কি শ্রান্তি নাই, শান্তি নাই, ক্ষান্তি নাই।

ভাই হাততালি। আর যা কর, তা কর, দিন কতক গোটা দুই তিন লোককে স্থির থাকিতে দাও। স্থির হইতে দাও। দোহাই তোমার হাসি মুখের, দোহাই তোমার বিস্ফারিত চক্ষুর, দোহাই তোমার আনত মেরুদণ্ডের, দোহাই তোমার দশ অঙ্গুলির, দোহাই তোমার শত বদনের, দোহাই তোমার সহস্র জিহ্বার, দিনকতক গোটা দুই লোককে তুমি স্থির হইতে দাও—তিষ্ঠিতে দাও।

একজন এই সুরেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথ তরল, সুরেন্দ্রনাথ চপল; স্বীকার করিলাম, সুরেন্দ্রনাথ একটুতে চালিত হন, একটুতে তাড়িত হন। স্বীকার করিলাম, সুরেন্দ্র বলিবার সময় কথার ঝোঁক এড়াইতে পারেন না, ছন্দের মায়া

ভুলিতে পারেন না, বক্তৃতার লয়-তালের জন্য লালায়িত। তবু ত সুরেন্দ্রনাথ দেশের জন্য লেখেন, দেশের জন্য বলেন, দেশের জন্য ভাবেন—আজিকার দিনে সে কি কম কথা? স্বীকার করিলাম সুরেন্দ্রনাথ স্বার্থপর। অপরাধ লইও না. সকলে এক একবার আপনার বক্ষে হস্ত দান করিয়া ঊর্দ্ধমুখে বল দেখি, তোমরা কি স্বার্থপর নও। স্বীকার করিলাম, সুরেন্দ্রনাথ স্বার্থপর, কিন্তু স্বার্থানুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি কি পরার্থ একেবারে ভুলিয়া যান? তাঁহার চরিত্র যে একরূপ বিসদৃশ তাহা ত স্বীকার করিতে পারিলাম না,—তবে তিনি স্বার্থপর হইলেন? তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি? না—ভালতে মন্দতে এখনও সুরেন্দ্রনাথ আমাদের গৌরব; জাতির গৌরব; দেশের গৌরব। যদি সুরেন্দ্রনাথের অধঃপতন হয়, তবে সে আমাদেরই দোষে হইবে। আর কলঙ্কী হাততালি! তোমার দোষে হইবে।

রাজনীতির অকূল-সাগরে সুরেন্দ্রনাথের চপলা-মতি তরণী একটুতেই বিক্ষোভিত হইতেছে,—যে পার সে রক্ষা কর। পাঠ্যাবস্থা শেষ হইতে না হইতে তিনি সিবিল সার্ব্বিশ কমিশনরগণের বিড়ম্বনায় বড়ম্বিত; রাজসেবায় প্রথম বয়সেই চপল স্বভাব নিবন্ধন লাঞ্ছিত; সম্পাদক জীবনের পাঁচ বৎসর না গত হইতেই সুরেন্দ্রনাথ রচনার অলঙ্কার দোষে কারাবন্দী—যে উঠিতে বসিতে আঘাত খাইতেছে, তাহার রাজনৈতিক জীবন যে কপটতা বা স্বার্থপরতার পরিচ্ছদ মনে করিতে চায়, সে করুক,—আমরা তাহা করিব না। না সুরেন্দ্রনাথ সত্য সত্যই দেশহিতৈষী—এখনও সুরেন্দ্রনাথ আমাদের জাতির গৌরব, দেশের গৌরব। তাঁহাকে প্রকৃত পথে চালিত করিতে পারিলে আমাদের দেশের লাভ, জাতির লাভ হইতে পারে। তবে যদি সুরেন্দ্রনাথের অধঃপতন হয়—সে আমাদের দোষেই হইবে—আর কালামুখ তুমি, তোমার চট্‌চটির খরতালে হইবে।

আর একদিকে, আর এক পথে আমাদের আশার স্থল, ভরসার সম্বল, রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগর মহাশয়, বঙ্কিমবাবু বা অন্যান্য খ্যাতনামা বর্ষীয়ানগণের

কথা ধরি না। তোমার অসার আস্ফালনে উদাসীনতা প্রদর্শনের উপহাসে হাস্য করিবার অধিকার অনেক দিন হইল তাঁহাদের হইয়াছে। বয়স বিগুণে রবীন্দ্র-নাথের সে অধিকার এখনও হয় নাই,—তাই হাততালি, তাঁহার জন্য, আমাদের রবীন্দ্রনাথের জন্য, আজ তোমার কাছে আমাদের এই উপাসনা।

রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার দীপশিখা; ধীরে ধীরে জ্বলিলে এই শিখা স্বীয় বর্দ্ধমান আলোকে চারিদিক্ আলোকিত করিবে; প্রাচীন হিন্দুর সুগন্ধি তৈল নিষেবিত দীপের ন্যায় সেই অমল আলোকের সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধে চারিদিক্ আমোদিত করিবে। সেই অমল, কোমল, কমল-শোভাসমন্বিত মুখশ্রী—সেই উজ্জ্বল, সলজ্জ ভাসা ভাসা, ভ্রমর-ভর-স্পন্দিত-পদ্ম-পলাশ-লোচন—সেই ঝামর-চামর-নিন্দিত, গুচ্ছে গুচ্ছে স্বভাব-বেণীবিনায়িত চিকুর ঝলঝল মুখমণ্ডল,—সেই রহস্যে আনন্দে মাখান, হাসি খুসী ভরা অধরপ্রান্ত—সেই সৎচিন্তার প্রসব ক্ষেত্র, সুন্দর, শুভ্র, পরিষ্কার দর্পণোপম ললাট—ভগবানের এরূপ অতুল সৃষ্টি কখন বৃথা হইবার নহে। না, এখনও রবীন্দ্রনাথ আমাদের আশার স্থল, ভরসার সম্বল; তুমি না লাগিলে তিনি এখনও আমাদের দেশের গৌরব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। তুমি না লাগিলে—আর তুমি লাগিলে? তোমার সেই লক্ষ হস্তের দশ লক্ষ চটচটি একবার প্রতি নিয়ত ধ্বনি করিলে, বীরের বীরাসন টলে, তা কোমল বঙ্গ-সন্তানের কি আর স্থৈর্য্য থাকিবে? ভাই স্বীকার করিলাম তুমি বাহাদুর,—তুমি মনে করিলে বীরপাত করিতে পার, কিন্তু তোমার হাতে ধরি, বিনয় করি,—তুমি দিন কতক ক্ষান্ত থাকিবে না কি?

রামগতি ন্যায়রত্ন

১৮৩১—১৮৯৪

জন্ম

৪ জুলাই ১৮৩১ (২১ আষাঢ় ১২৩৮) তারিখে হুগলী জেলার অন্তর্গত ইলছোবা গ্রামে রামগতি ন্যায়রত্নের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—হলধর চূড়ামণি

ছাত্র-জীবন

রামগতি দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্থানীয় পাঠশালায় শিক্ষালাভ করেন ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। সে সময় সংস্কৃত কলেজে তাহার ন্যায় মেধাবী ছাত্র খুব কমই ছিল।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম বার জুনিয়র-বৃত্তি পরীক্ষা দেন ও ৮৲ মাসিক বৃত্তি লাভ করেন পর-বৎসর তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ৮৲ জুনিয়র-বৃত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হন।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম বার সিনিয়র-বৃত্তি পরীক্ষা দেন ও মাসিক ২০৲ বৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তি-পরীক্ষায় জি টি. মার্শেল মন্তব্য করেন :—

> Among the students, special praise is due to Ram Kumal Sharma (1st) and Ramgati Sharma of the Senior dept, Ramgati Sharma gave, on this occasion, his first examination in the Senior dept, and yet he stands second on the list —*General Rep on Pub. Instruction* for 1850 51, p 45

১৮৫২-৫৫ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষাবিষয়ক সরকারী রিপোর্ট পাঠে জানা যায়, ১৮৫৪ ও ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় শ্রেণী হইতে পরীক্ষা দিয়া রামগতি

প্রতি বারই ১৬৲ সিনিয়র-বৃত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হন। এই রিপোর্টে আরও প্রকাশ :—

Ramkamal Bhattacharjee and Girish Ch. Mookerjea of the 1st class, Shome Nath Mookerjea of the 2nd class, and Ramgati Banerjea of the third class, deserve special notice. Of these again Ramkamal and Ramgati stand pre-eminently superior having attained great success in every branch of their respective studies. (p. 27)

চাকুরী-জীবন

ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া শিক্ষাদান-ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁহার চাকুরী-জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি :—

২৫ আগষ্ট ১৮৫৬ :	দ্বিতীয় অধ্যাপক, হুগলী নর্ম্মাল স্কুল, বেতন ৫০৲।
ডিসেম্বর ১৮৬২ :	প্রধান শিক্ষক, বৰ্দ্ধমান (লাকুড্ডি) গুরু ট্রেনিং স্কুল, বেতন ১০০৲।
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৫ :	সংস্কৃতাধ্যাপক, বহরমপুর কলেজ, বেতন ১৫০৲।
২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯* :	হেড মাষ্টার, হুগলী নর্ম্মাল স্কুল।
অবসর গ্রহণ :	জুলাই ১৮৯১।

মৃত্যু

চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় তিন বৎসর তিন মাস পেন্‌সন ভোগ করিয়াছিলেন। ৯ অক্টোবর ১৮৯৪ তারিখে চুঁচুড়ার বাটীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

* Hist. of Services of Gazetted Officers...(1891), p. 895.

গ্রন্থাবলী

ন্যায়রত্ন মহাশয় যে-সকল গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন, সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল :—

১। **কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ এবং অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস।**

মাঘ, ১৯১৪ সংবৎ (ইং ১৮৫৮)। পৃ. ৯৩+১ শুদ্ধিপত্র।

"শ্রীযুক্ত কাপ্তেন্ রিচার্ডষন্ সাহেব প্রণীত ইংরেজী পুস্তক হইতে এই গ্রন্থ খানি অনুবাদিত।"

২। **বস্তুবিচার।** ১৫ পৌষ সংবৎ ১৯১৫ (ইং ১৮৫৮)।

"এতদ্দেশীয় সাহায্যকৃত বাঙ্গালা বিদ্যালয়সমূহে বস্তুবিদ্যার অনুশীলন অতিশয় আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় ঐ বিষয়ের একখানিও পুস্তক নাই। এই বিবেচনা করিয়া কয়েকখানি ইঙ্গরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলন পূর্ব্বক সচরাচর-প্রচলিত ও শুশ্রূষাজনক-গুণ-সম্পন্ন কতিপয় বস্তুর আকার প্রকার, প্রয়োজন ও উৎপত্তির বিবরণ প্রভৃতি কিঞ্চিৎ লিখিয়া এই গ্রন্থ মধ্যে নিবেশিত করিলাম।" - বিজ্ঞাপন।

৩। **বাঙ্গালার ইতিহাস,** ১ম ভাগ। ১ বৈশাখ সংবৎ ১৯১৬ (ইং ১৮৫৯)।

"ইহাতে বৈদ্যবংশীয় হিন্দু রাজাদিগের চরমাবস্থা অবধি নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর অধিকারকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশের প্রসিদ্ধ ঘটনা সকল সঙ্ক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।"

৪। **রোমাবতী।** (আখ্যায়িকা) ২৫ পৌষ সংবৎ ১৯১৮ (ইং ১৮৬২)।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ এই পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

তখন বেলা প্রায় দুই প্রহর হইয়াছিল। মাধবিকা ইতস্ততঃ অন্বেষণ করত নানাবিধ সুস্বাদ বন্য ফল আহরণ করিয়া রাজনন্দিনীকে ভোজন করাইল, এবং তাঁহার অনুরোধে আপনিও ভোজন করিল। ভোজন সমাপন হইলে সে রাজতনয়ার আদেশে নারিকেল, রুদ্রাক্ষফল,

বল্কল, শুষ্কেন্ধন প্রভৃতি যোগী সাজিবার নানাবিধ উপকরণ সমাহরণ করিয়া তাঁহাকে সাজাইতে বসিল। আহা! রোমাবতীর যে কেশপাশ পূর্ব্বে বিচিত্র কবরীবন্ধন ও শিরোরত্নে শোভিত হইত, এক্ষণে মাধবিকা সেই কেশ বিনাইয়া অপূর্ব্ব জটাজূট প্রস্তুত করিয়া দিল। যে শরীর অগুরু, কুঙ্কুম, গন্ধসার প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যে সুবাসিত থাকিত, এক্ষণে সেই স্বর্ণ-অঙ্গে দারুঘর্ষণজ-বহ্নি ভস্ম লেপিত হইতে লাগিল। যিনি সর্ব্বদা অপূর্ব্ব কৌষেয় বসন পরিধান করিতেন, তিনিই এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বল্কল সকল সংযোজিত করিয়া গাত্রাচ্ছাদন করিলেন। যে পীনোন্নত পয়োধরে অপূর্ব্ব রত্নহার বিরাজিত হইত, সম্প্রতি সেই স্থানে অভিনব রুদ্রাক্ষমালা সমর্পিত হইল। যে পাণি কমল বা কুসুমস্তবকে সর্ব্বদা সুশোভিত থাকিত, অধুনা সেই পাণিতে নারিকেল-নির্ম্মিত কমণ্ডলু লম্বমান হইল। যে নিতম্ব মুক্তাময় সারসনে অলঙ্কৃত হইত, এক্ষণে তথায় ত্রিনরী মুঞ্জময়ী মেখলা সমাবদ্ধ হইল। আহা! সে রূপের শোভা আর কি বর্ণন করিব। তৎকালে উহা কেবল ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি, মেঘান্তরিত শশিবিম্ব ও পাংশু-লিপ্ত মহামণির ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। যাহা হউক, তিনি স্বয়ং এইরূপ অপূর্ব্ব যোগিবেশ ধারণ করিয়া মাধবিকাকেও আপনার ন্যায় সাজাইয়া দিলেন। অনন্তর, তাঁহারা দুই জনে সর্ব্বজন-মোহনাকার দুই তাপসকুমার হইয়া সেই মেঘনীল শৈলের সন্নিধানে গমন করিলেন। অনন্তর এক বন্ধুর পথ অবলম্বন করিয়া উহার এক রমণীয় প্রস্থদেশে আরোহণ পূর্ব্বক সে রাত্রি তথায় যাপন করিলেন। (পৃ. ১৩৫-৩৬)

৫। **বাঙ্গালা ব্যাকরণ।** ইং ১৮৬৪। পৃ. ৯২।

ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির বাংলা পুস্তক-তালিকা পৃ. ১৭২ দ্রষ্টব্য।

৬। **ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস।** ইং ১৮৬৫। পৃ. ২০৪।

ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির বাংলা পুস্তক-তালিকা পৃ. ৪৮ দ্রষ্টব্য।

"কিছু স্বল্পায়াসে ছাত্রেরা পরীক্ষাপ্রদানোপযোগী জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে, এই উদ্দেশ্যে এই ভারতবর্ষের সমস্ত অর্থাৎ সঙ্ক্ষিপ্ত ইতিহাস

খান সঙ্কলিত হইল। ইহাতে হিন্দু রাজগণের অধিকার হইতে গবর্ণর জেনেরেল লর্ড নর্থব্রাকের আগমন পর্য্যন্ত সমস্ত সময়ের স্থূল স্থূল বিবরণ সকল সঙ্ক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে।"—বিজ্ঞাপন।

৭। **ঋজু ব্যাখ্যা।** ইং ১৮৬৬ (?)

৮। **শিশুপাঠ।** ১৮ মার্চ ১৮৬৮। পৃ. ৩৬।

৯। **দময়ন্তী।** ২৫ জানুয়ারি ১৮৬৯। পৃ. ৫৮।

দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা "A Tale in Sanskrit Prose rendera from the Mahabharat."

১০। **চণ্ডী।** ৫ জুন ১৮৭২। পৃ. ১০৯।

১১। **বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব,** ১ম ভাগ। শ্রাবণ ১৯২৯ সংবৎ (ইং ১৮৭২)। পৃ. ১৬৮।

"এই ভাগে বাঙ্গালাভাষার উৎপত্তির বিবরণ, প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর রচনার সময় পর্য্যন্ত এই কালমধ্যে উক্ত ভাষার যে যে রূপ অবস্থা ঘটিয়াছে—ঐ কালে রচিত প্রধান প্রধান বাঙ্গালাগ্রন্থ সকলের সঙ্ক্ষিপ্ত সমালোচনাসহকারে—তাহার উল্লেখ, এবং তত্তদ্‌গ্রন্থকারগণের কিঞ্চিৎ জীবনবৃত্ত প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে।"—বিজ্ঞাপন।

ইহার ২য় ভাগ (পৃ. ১৬৯-৭৩) কয়েক খণ্ড স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে (পৃ. ৩৭৩) ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে (আষাঢ়, সংবৎ ১৯৩০) প্রকাশিত হয়। "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ :—"এই পুস্তক বৃহৎ হইয়া উঠিল, দেখিয়া ইহার কিয়দংশের কতিপয় খণ্ড প্রথমভাগ নামে পূর্ব্বে প্রচারিত করিয়াছিলাম। এক্ষণে অবশিষ্টাংশের কতিপয় খণ্ড দ্বিতীয়ভাগ নামে প্রকাশ করিয়া উভয় ভাগেরই অপর সমুদয় খণ্ড এক সম্পূর্ণ খণ্ডে প্রকাশিত করিলাম।"

এই গ্রন্থখানি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কীর্ত্তিস্তম্ভ।

১২। **গোষ্ঠী কথা।** (মজলিসি গল্প) ৭ জুন ১৮৭৭। পৃ. ৯৩।

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরিতে ইহার আখ্যাপত্রহীন এক খণ্ড আছে। ইহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আকারেই ব্যক্ত।—মহাদেব তর্কভূষণের পুত্র ব্রজেন্দ্র ভট্টাচার্য্য কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে আপনার সাংসারিক ক্লেশের কথা জানাইয়া কহিল, মহাশয়! আমার পিতা দেশবিখ্যাত লোক ছিলেন, কিন্তু আমি উদরান্নের জন্য লালায়িত—আমার বড় দুরাদৃষ্ট। বিজ্ঞ ব্যক্তি কহিলেন—তাহা আকারেই (া) ব্যক্ত হইতেছে।"

১৩। **কুপিতকৌশিক নাটক**। বৈশাখ ১২৮৫ (ইং মে ১৮৭৮)। পৃ. ৮৫।

"...যদি কোনও নাটকে অধিক সংখ্যায় গীত থাকে, তাহা হইলে বোধ হয়, যাত্রাকারকদিগের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। সেই সুবিধাকরণের অভিপ্রায়েই আর্য্যক্ষেমীশ্বর-প্রণীত সংস্কৃত চণ্ডকৌশিক নাটক অবলম্বন করিয়া এই কুপিতকৌশিক নাটক রচিত হইল। ইহাতে ৬০টী গীত আছে।... ২৫এ বৈশাখ সংবৎ ১৯৩৫। "বিজ্ঞাপন"

আখ্যা-পত্রে লেখকের নাম নাই।

১৪। **নীতিপথ**। ১৭ আষাঢ় ১৯৩৮ সংবৎ (ইং ১৮৮১)। পৃ. ৯৬। ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত বাংলা পুস্তকের তালিকা পৃ. ৯০ দ্রষ্টব্য।

১৫। **রামচরিত**। ১২৮৯ সাল (ইং ১৮৮২)। পৃ. ১০১।

" "পরিণত-প্রজ্ঞ" মহাকবি ভবভূতি, তাঁহার মহাবীর চরিত নাটকে, শ্রীরামচন্দ্রচরিতের উল্লিখিত সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতা বিশিষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া ইহাকে এক স্থলে "চারিত্র পঞ্জিকা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।... পাঠকবর্গ ঐ সংস্কৃত নাটকের উপাখ্যান ভাগের এই স্থূল বাঙ্গালা অনুবাদে, মহাকবির বিমল, সুগভীর এবং সুপ্রশস্ত ভাব সকলের যৎসামান্য আভাসমাত্রই পাইবেন সন্দেহ নাই।"

বাগবাজার রীডিং রুমে এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড আছে।

১৬। **ইলছোবা**। অথবা স্বপ্নলব্ধ উপাখ্যান। জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ সাল (ইং ১৮৮৮)। পৃ. ১৪৪।

"ইলছোবা-নিবাসী যে ব্রাহ্মণ বট-বৃক্ষ-মূলে বসিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাঁহারই মুখে যেরূপ অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাই এ পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পণ্ডিতেরা কহেন "স্বপ্ন অমূলক চিন্তামাত্র!"

রচনার নিদর্শন :—

অদ্য ফাল্গুনের শুক্লা চতুর্দ্দশী, প্রতি বৎসর এই দিনে এই স্থানে যাত (মেলা) হইত। ঐ যাতের নাম ভগবতীযাত্রা। ভগবতী-যাত্রা চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা, ও প্রতিপদ্ এই তিন দিন থাকিত। কত দেশের কত লোক কত রূপ দ্রব্য লইয়া আসিয়া এই যাতে ক্রয় বিক্রয় করিত। তখন্ এখানে যেন একটী নবনির্ম্মিত নগর হইত। তখন্ কত রোগী আরোগ্য-লাভাশয়ে—কত বন্ধ্যা পুত্রকামনায় এবং কত লোক অন্যান্য অভীপ্সিত-সিদ্ধির বাসনায় আমার দ্বারে হত্যা দিত এবং সিদ্ধমনোরথ হইলে কত সমারোহে পূজা দিয়া যাইত। তখন্ কত স্থানে নৃত্য গীত বাদ্য, কত স্থানে অশ্বধাবন, কত স্থানে মল্লক্রীড়া, কত স্থানে মেষ কুক্কুট প্রভৃতি পশুপক্ষীর যুদ্ধ, কত স্থানে কবিতাপাঠ ও কত স্থানে কত প্রকার আমোদ হইত। প্রান্তরের নিম্নভাগেই যে বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র সকল দেখিতেছ, ঐ স্থানে তখন্ প্রবাহিণী নদী ছিল; ঐ নদীর তীরে বিস্তর কঙ্কপক্ষী দৃষ্ট হইত, এই জন্য উহাকে কঙ্কনদী কহিত। তোমার বাসগ্রামে বহুদূর পশ্চিমস্থ নানা জলাপ্রদেশের জলসকল একত্র জমিয়া নদীর আকার ধারণ করে এবং তাহাই গ্রামের মধ্যদেশ ভেদ করিয়া এই প্রান্তরের নিম্ন দিয়া উত্তরপূর্ব্বাভিমুখে গমন পূর্ব্বক শাখাবেহুলায় পতিত হইয়াছিল। এই নদীতে বার মাসই জল থাকিত। তবে বর্ষাকালে যেরূপ বড বড় নৌকা আসিত, অন্যকালে সেরূপ নৌকা আসিতে পারিত না। তৎকালে নদীর তীরভূত এই প্রান্তরের মধ্যে নানা জাতীয় লোকের বসতি ছিল। ঐ পূর্ব্ব দিকে, এক্ষণে যে স্থান ঝিট্‌কীপোঁতা নামে খ্যাত, ঐ স্থানে কয়েক ঘর কুম্ভকারের বাস ছিল। তাহারই অব্যবহিতপূর্ব্বে নদীর ধারে ধারে পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত রাজ-ভবন। রাজভবনে হস্তী, অশ্ব, গো, মেষ, মহিষ প্রভৃতি নানা পশু ও নানাজাতীয় বহুসঙ্খ্যক নরনারী অবস্থান করিত। নদীগর্ভ হইতে সুধা-ধবলিত বিস্তৃত সৌধমালা কি সুন্দরই দেখাইত!—আমার দেউল (দেবকুল=মন্দির) নদীর দক্ষিণ পারে ছিল—যাত্রায় সমাগত লোকেরা দ্রোণীদ্বারা নদী পার হইয়া আমাকে দর্শন করিতে ও আমার পূজা দিতে যাইত। পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্বে জটা-ভস্মধারী কত অবধূত সন্ন্যাসী বাস করিত। যাত্রিকদিগের প্রদত্ত পূজোপকরণ দ্বারাই তাহাদিগের সুনির্ব্বাহ হইত। বৎস! তুমি বুঝিতে পারিবে যে, নদী

বন গ্রামাদির অবস্থা চিরকাল এক ভাবে থাকে না—সময়ে নদী তট হয়—তট নদী হয়—নগর বন হয়—বন নগর হয়—মরু জলাশয় হয় এবং জলাশয় মরু হইয়া যায়। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তোমাদিগের গণনায় তাহা হয় ত ৫০০ বৎসর হইবে—কিন্তু আমার যেন তাহা সে দিন বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি এখনও যেন ও স্থানের সেই সৌন্দর্য্য—সেই সমৃদ্ধি—সেই জনাকীর্ণতা চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু সে সকল আর কিছুই নাই। এস্থান এক্ষণে জনশূন্য প্রান্তর হইয়াছে! হায়! মর্ত্যলোকের অবস্থা কি পরিবর্ত্তনশীল!! (পৃ. ৪-৬)

* * *

উত্তম স্ত্রীকে যে গৃহ-লক্ষ্মী বলে, তাহা যথার্থ কথা। অপেক্ষাকৃত অর্থশালী অনেক লোকের গৃহে অনেক দ্রব্যসামগ্রী আইসে, কিন্তু অব্যবস্থিত গৃহিণীর হস্তে পতিত হওয়ায় সে সকল মাটী হয়। তাহাদের শয়নগৃহের অবস্থা দর্শন করিলে সময়ে সময়ে ঘৃণা উপস্থিত হয়—বিছানার আস্তরণ মলিন ও দুর্গন্ধ; বালিসের ওয়াড় তেলে ডুবু ডুবু, অথবা ওয়াড় দেওয়া হয় না বলিয়া খোল পর্য্যন্ত তেল চটচটে। ওয়াড় গুলা ধোবা বাটী হইতে আসিয়া, হয় খাটের তলে বা সিন্দুকের পার্শ্বে পড়িয়া থাকে, না হয় তাহার দুই একটাকে দড়ি করিয়া মসারি খাটান হয়। প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয্যা ঝাড়া বা তোলা হয় না; সমস্ত দিন শয্যা ভ্যান্ ভ্যান্ করে, যদি কখনও তোলা হয়, তবে সমুদয় জড়াইয়া সড়াইয়া আলু থালু মোটের মত এক কোণে ফেলিয়া রাখা হয়। শয্যার মধ্যে না পাওয়া যায়, এমন বস্তুই নাই—মুড়ি মুড়্কি, লুচি সন্দেশের গুঁড়া, মাথার ফুল, কাণের মাকুড়ি, আকের ছিব্ড়া, লেবুর খোলা, চুলের দড়ি, শিশুদিগের মল মূত্রের গন্ধ—এ সকলই মেলে। ঘর ঝাঁইট্ দিয়া কোন দ্রব্য পোঁছা হয় না—সুতরাং খাটের গা, সিন্দুক, পেট্রা প্রভৃতি ধূলায় থুক্ থুক্ করে। নিত্য ব্যবহারের বস্ত্র সকল রৌদ্রে শুষ্ক হইলে বাহিরের আল্না হইতে, প্রয়োজন না পড়িলে, তোলা হয় না; কোন কোন খানি বাতাসে উড়িয়া আস্তা কুড়ে পড়ে, ২।৩ দিন সেই খানেই থাকে এবং উইএর ভক্ষ্য হয়। যদিও কখনও সেগুলি তোলা হয়, তবে এমত গোল করিয়া ঘরের আল্নায় রাখা হয় যে, একখানি পাড়িতে গেলেই সকল গুলি না পড়িয়া থাকে না। (পৃ. ১৩-১৪)

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সকল স্মরণীয় সাধকের প্রামাণিক জীবনী ও কীর্ত্তিকথা

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।•, কেবল * চিহ্নিত ৫খানি পুস্তক ।•

*১। কালীপ্রসন্ন সিংহ, ২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রামকমল ভট্টাচার্য্য, ৩। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। রামনারায়ণ তর্করত্ন, ৬। রামরাম বসু, ৭। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, ৮। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, ৯। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী, ১০। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১১। তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ১২। অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৩। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ১৪। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, ১৫। উইলিয়ম কেরী, *১৬। রামমোহন রায়, ১৭। গৌর-মোহন বিদ্যালঙ্কার, রাধামোহন সেন, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ন হালদার, *১৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯। প্যারীচাঁদ মিত্র, ২০। রাধাকান্ত দেব, ২১। দীনবন্ধু মিত্র, *২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *২৩। মধুসূদন দত্ত, ২৪। হরিশ্চন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ২৫। বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত, ২৬। শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার, রামচন্দ্র মিত্র, ২৭। নীলমণি বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, ২৮। স্বর্ণকুমারী দেবী, ২৯। মীর মশার্‌রফ হোসেন, ৩০। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, লালমোহন বিদ্যানিধি, ৩১। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ৩২। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৩। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫। হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ), ৩৬। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩৭। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৮। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ৩৯। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামগতি ন্যায়রত্ন, ৪০। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (যন্ত্রস্থ)।